Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি

রাজু বিশ্বাস

Independent Researcher
West Bengal, India

সারসংক্ষেপ

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে ধারণা করা যায় "বাঁকুড়া" জনপদের মনুষ্য বসবাসের সূত্রপাত হয়েছিল সুপ্রাচীনকাল থেকে। এই "বাঁকুড়া" জনপদটি "মল্লভূম" অঞ্চলের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত । বাঁকুড়াতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থাকলেও প্রধানত ভূমিজ (সর্দার), মুন্ডা, সাঁওতাল এই তিনটি জনগোষ্ঠীকে প্রধান ধরা হয়েছে। এছাড়াও কিছু উপগোষ্ঠী দেখা দেয় সেগুলি হল বাগদী, বাউড়ী, পুলিন্দ, জেলে, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি। আমি আমার গবেষণাপত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি "বাঁকুড়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের খাদ্যাভাস ও সংস্কৃতি"। বাঁকুড়ার আদিবাসী সমাজের খাদ্যাভাসের তালিকায় ছিল মাছ, মাংস ও অন্যান্য খাদ্য । তাঁরা শামুক কাঁকড়া, মোরগমাংস ও পঞ্চনখা প্রাণীর মাংস খেত। এছাড়াও মাছের তালিকায় ছিল বিভিন্ন রকম আঁশ ছাড়া মাছ ও সর্পাকৃতি বান মাছ। তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলাদা আলাদা খাবার গ্রহণ করে। শুকরের মাংস, মুরগির খিচুড়ি তাদের প্রিয় খাবারের তালিকায় পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি বলতে আমরা দেখেছি মকর সংক্রান্তি, করম উৎসব, বান্দনা বা সাহারাই, গাজন মেলা, ধারার মেলা, ঝুমুর নাচ প্রভৃতি। যেসব সংস্কৃতি ভারতের আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। এদিক থেকে দেখতে গেলে তাদের খাদ্যাভাস ও সংস্কৃতি অন্য সম্প্রদায়ের থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র।

শব্দসূচক: খাদ্যাভ্যাস, পরব, সংস্কৃতি, ভাষা, জনগোষ্ঠী, খাদ্য।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর বিষ্ণুপুর ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির অধীনে আসে এবং ১৭৭০ সালের মন্বন্তরে এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক কাঠামো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ১৭৮৭ সালে বিষ্ণুপুর ও বীরভূম জেলা দুটি সংযুক্ত করে একই জেলায় পরিণত করা হয়। ১৭৯৩ সালে বিষ্ণুপুরকে বীরভূমকে জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ধমান জেলার সাথে সংযুক্ত করা

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

হয়। ১৮০৫ সালে বিষ্ণুপুরকে জঙ্গলমহল জেলার সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৩৭ সালে "বাঁকুড়াকে" সদর করে ও বিষ্ণুপুর কে পৃথক করে পশ্চিম বর্ধমান জেলা গঠন করা হয়। ১৮৮১ সালে বর্তমান "বাঁকুড়া" জেলা স্থাপন করা হয়।[১] এই অঞ্চলে সুপ্রাচীনকাল থেকে কৃষি-প্রধান ছিল এবং কৃষিতে অনেক উন্নত ছিল। এই জেলায় আদিবাসী অধ্যুষিত হওয়ায় আদিবাসী সংস্কৃতি ও তাদের জীবনধারণ কেমন ছিল তা আমরা আঞ্চলিক বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি। আদিবাসী মূলত কাদের বোঝানো হয়েছে এই নিয়ে মতপার্থক্য আছে, তবে এদেশের আদিম জনজাতিকেই বোঝানো হয়েছে।[২]

বাঁকুড়া জেলায় অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় থাকলেও প্রধানত তিনটি শ্রেণিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় বা তাদের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায় যেমন সাঁওতাল ,ভূমিজ (সর্দার) ও মুন্ডা । বাঁকুড়া জেলায় প্রায় ৩৮৩২টি গ্রাম আছে সেখানে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ বসবাস করলেও এই তিন শ্রেণীর মানুষকে প্রধানত দেখা যায়।বাংলার মানষ সংস্কৃতি ও খাদ্যাভাস ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা ও কালক্রমানুযায়ী সবিস্তারে বলিবার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের নেই। আহার- বিহার ,বসন, ভূষন, খেলাধুলা, আমোদ- উৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য শুধু বর্তমান। এবং এসব জানার জন্য গ্রন্থ সমসাময়িক কালে কেহ রচনা করেনি। তবে আদিবাসী সম্প্রদায় খুব কষ্ট সহিষ্ণু ও জীবনধারণের জন্য কঠিন লড়াই করত এ কথা আমাদের সকলেরই জানা। তবে যেটুকু তথ্য পায় আমরা অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয়ে ঠিক ততটুকুই। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" ও বাৎসায়নের "কামশাস্ত্র" জাতীয় গ্রন্থেও কিছু কিছু সংবাদ ইতস্তত ও বিক্ষিপ্তভাবে পাই। আমরা বাংলার নগর সভ্যতার কথা প্রথম এই দুটি গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এই দুটি গ্রন্থ ছাড়া প্রাচীন বাংলার কথা আমরা সেভাবে জানতে পারি না।[৩] ইতিহাসের উষাকাল থেকে ধানি যে দেশের প্রধান উৎপন্ন বস্তু কে দেখে প্রধান খাদ্য ভাত তাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাত খাওয়ার অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলিয়া জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির দান। উচ্চ থেকে নিম্নতম সকলেরই প্রধান খাদ্য ভাত। ভাত সাধারণত খাওয়া হত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। দরিদ্র ও গ্রাম্য লোকেদের প্রধান খাদ্যের উপাদান ছিল বোধ হয় সাপ ও অন্যান্য সবজি তরকারি। দরিদ্র ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের ডাল খাওয়ার উল্লেখ কোথাও নেই। খাবারের তালিকায় ডালের বা কলাই এর উল্লেখ কোথাও নেই। শাকের মধ্যে পাট শাকের উল্লেখ আছে।[৪] এছাড়াও দই,পায়েস, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানা প্রকারের খাদ্যের উল্লেখ একাধিক ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি এগুলি বাঙালির ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের খাদ্য তালিকায় পাওয়া গেছে। ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে নানা প্রকারের দুগ্ধ পান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে। কিন্তু সমস্তটাই

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

স্বাস্থ্যগত কারনে।[৫] এছাড়াও অন্যান্য খাবারগুলির মধ্যে ছিল মাংস মাছ ও অন্যান্য জিনিস। মাংসের মধ্যে ছিল হরিনের মাংস বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল যেটি শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষরা গ্রহন করত । এছাড়াও অভিজাত স্তরে ছাতা মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল। তবে কোন কোন জায়গায় শুকনো মাংস খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। বারিবহুল, নদ- নদী খাল বহুল প্রশান্ত সভ্যতা প্রভাবিত এবং আদি অস্ট্রেলিয় বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু হবে এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মাংসের প্রতি বাঙালির বিরাগ কোনদিনই ছিল না। কিন্তু আর্যব্রাহ্মণ্য ভারতে ছিল। বিশেষভাবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম শতক হইতে খাদ্যের জন্য প্রাণীর হত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে তো বটেই। একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশ দানা বেঁধেছিল।[৬]

প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তেল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়ে জিমুতবাহন ইলিশ মাছের তেলের কথা উল্লেখ করেছেন। আজকের মত প্রাচীনকালেও ইলিশ মাছের কথা উল্লেখ আছে। সাঁওতালি সমাজে মাছের প্রতি একটা ভালোবাসা ছিল প্রাচীনকাল থেকে। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা মাছ ভক্ত ছিল না। যা ছিল তৎকালে শাস্ত্রবিরোধী। এছাড়াও ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস,বক, হাঁস,দ্যাতুহ, পক্ষী, উট, গরু ,শুকর এগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে যেমন আদিবাসী কৌমের মানুষদের মধ্যে আজকের মতই শামুক, কাঁকড়া, মোরগ মাংস এছাড়াও নানারকম মাছ যেমন আশ ছাড়া মাছ সর্পাকৃতি বানমাছ, নানা প্রকার অকুলিন মৎস্য ও বিভিন্ন ধরনের পক্ষী ভক্ষন করার চল ছিল। এছাড়াও পঞ্চনখা প্রাণীদের মধ্যে গাধা, শশক, সজারু এবং কচ্ছপ খাবার বিধি নিষেধ ছিল না। বাঙালির মৎস্য প্রীতির কথা "পাহাড়পুর" এবং "ময়নামতির" পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু বর্ণিত আছে। একাধিক চর্যাগীতে।[৭] জালের সাহায্যে হরিন শিকারের কথাও একাধিক চর্যাগীতিতে উল্লেখ আছে। বাংলার অন্যান্য জেলার মতো বাঁকুড়াতেও বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সবজি বা তরিতরকারি খাওয়ার রীতি আমরা দেখতে পাই। যেমন বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরোল ,কচু প্রভৃতি আদি অস্ট্রেলিয় বা অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এইসব সবজি বাঙালি খুব প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার করে আসছে। পরবর্তীকালে বিশেষভাবে মধ্যযুগে পোর্তুগিজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য সূত্রে যেমন আলু আমাদের খাদ্যের মধ্যে এসে গেছে। আলু পোর্তুগিজদের অবদান।[৮] পোর্তুগিজদের আসার আগে ভারতবর্ষে আলুর কোন প্রচলন ছিল না। এছাড়াও বিভিন্ন শাক খাওয়ার রীতি ছিল। ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারিকেল ও ইক্ষুর উল্লেখ পাওয়া যায়। আম ও কাঁঠালের উল্লেখ বিভিন্ন লেখ মালায় পাওয়া যায়। কলা আদি অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষদের দান। প্রাচীন বাংলার

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

চিত্রে ও ভাস্কর্য কলাগাছের চিত্র প্রচুর পাওয়া যায়। পূজা বিবাহ মঙ্গলযাত্রায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও কলা গাছের ব্যবহার অনেক সাহিত্যে আমরা পেয়েছি। এছাড়াও বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ এমনকি বাঁকুড়াতেও দেখা গেছে ইক্ষু রস আজকের মত তখন পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হত। ইক্ষু রস জ্বাল দিয়ে একপ্রকার গুড় তৈরি করা হত। হেমন্তকালে গুড়ের গন্ধে আমদিত বাংলার গ্রামের বর্ণনা "সদুক্তিকথামৃত" গ্রন্থে আছে। তেঁতুলের উল্লেখ আছে "চর্যাগীতিতে"। খই, মুড়ি খাওয়ার প্রচলন ছিল সে যুগে।[৯]

কৃষি প্রধান দেশে ফসল জলের ওপরে একান্ত ভাবে নির্ভরশীল তাই প্রজাপতি বলেছেন, প্রচার জন্য আমি বহু হব। তিনি জল দেখলেন জল বহু হব প্রজার জন্ম দেব। জল তখন অন্ন সৃষ্টি করল। তাই পৃথিবীর যেখানে বৃষ্টি হয় সেখানেই প্রচুর 'অন্ন' বা 'ধান' উৎপন্ন হয়। তাই জল থেকে আহার্য 'অন্ন' উৎপন্ন হয়। সিন্ধু সভ্যতায় যে সেচ ব্যবস্থা ছিল, আর্যরা এদেশে আসার পর তা অনেকটাই বিনষ্ঠ হয়ে যায়। ফলে প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয় আর্য থেকে কৃষি বৃষ্টিনির্ভর। জল থেকে অন্ন, সেই সেই অন্নই প্রজার জীবন। তাই অন্নকে নিন্দা করা যাবে না। তাই বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। শরীর হলো অন্নভোজী। তাই এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত,। শরীর বেঁচে থাকে প্রানে, প্রানের অবলম্বন অন্ন। তাই অন্ন জীবনকে রক্ষা করে, তাই অন্নকে নিন্দা করা যাবে না। কিছু প্রাগার্য বা অপরিচিত জনগোষ্ঠীর কিছু খাদ্যকে হয়ত আগন্তুক আর্যরা তাচ্ছিল্য করত। অখাদ্য মনে করত। কিন্তু আদিবাসী সমাজের মানুষেরা খাদ্যের অভাব অনুভব করত। খুব কষ্ঠ করে মানুষ জীবন ধারন করত। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো বিপর্যয়ে মানুষ যখন কোন খাদ্য উৎপাদন হত না, তখন অখাদ্য খাদ্য হয়ে উঠত এবং প্রান রূপে দেখা দিত।[১০]

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভোজ বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিশুর জন্ম দিন বা অন্নপ্রাশন এদের মধ্যে নেই। তবে জন্মের তিন দিনের দিন আত্মীয়-স্বজন ডেকে নিম পাতা দিয়ে ফ্যান ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। আবার কেউ মারা গেলে দানের টাকা থেকে এরা প্রান ভরে মদ খায়। মৃতদেহ দাহ বা কবর দেওয়ার পর মুরগির খিচুড়ি খেয়ে বাড়ি যায়। মুরগির খিচুড়ি বিশেষ কিছু না। মুরগির মাংস রান্না করে খিচুড়ির হাড়িতে মিশিয়ে দেওয়া হয়।[১১] এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রাদ্ধের কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই। জিনিসপত্র জোগাড় হলে যোগমাঝির নেতৃত্বে শ্রাদ্ধ শুরু হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শুরু হয় রাত্রি বারোটা থেকে। ভোরের শ্রাদ্ধ শেষ হয় বলি হয়ে ।পরের দিন বলি দেওয়া পায়রা মুরগি বা শুকরের মাংস দিয়ে ভোজের আয়োজন করা হয়। সঙ্গে থাকে

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

প্রচুর মদ। বিয়ের সময় বরযাত্রীদের পাত্রীর বাড়িতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। বরযাত্রীদের ততক্ষণে নিজের আয়োজনে খেতে হয়। বিয়ে হয়ে গেলে খাওয়ার আমন্ত্রন হয়। বোঝ বলতে মদ মাংসের ফোয়ারা ছোটে। ভোজ বলতে শূকরের মাংস ও মদের যোগানই বেশি। সেই সন্ধ্যায় দুমুঠো মুড়ি আঁচলে বা গামছায় দিয়ে সকলকে বাড়ি পাঠানো হয়।[১২]

বাঁকুড়ার উপজাতি সম্প্রদায়গুলির কিছু পরব ও সংস্কৃতিঃ

বাঁকুড়ার আদিবাসী সমাজের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি ও পরম আছে যা অন্যদের থেকে ভিন্ন। অরন্যের সংকট অরন্যের অবলুপ্তি, নগর সভ্যতার সংস্পর্শ ও জীবিকার সমস্যা বর্তমানে এই উন্নত উপজাতির বৈশিষ্ট্য যা স্বতন্ত্র ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করতে শুরু করেছে। দারিদ্রতা ও শিক্ষার অভাবের জন্য দেশের বর্তমান অবস্থা, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির পটভূমি ও পরিবেশে এরা নিজেদের জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে। তাই সেখানকার কিছু পরব বা সংস্কৃতি আছে যা নিম্নে আলোচনা করা হল-

মকর সংক্রান্তিঃ

পৌষ এর শেষ দিনটিকে মকর সংক্রান্তি বলা হয়। তাই এই সময়টিকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা মকর পরব উদযাপন করে। মানুষজন মাংস ও ভাতের মিশ্রণ এবং বন মোরগের সাথে উৎসবের দিনগুলি উপভোগ করে।

করম উৎসবঃ

এই উৎসবটি ভাদ্র মাসের একাদশীতে পালন করা হয় এই উৎসবটি নিখুত চাষাবাদ এবং শিশুদের সুখের জন্য সাজানো হয়। এই উৎসব উদযাপনের সময় করম গাছের কেবল একটি শাখা গাছ থেকে নিয়ে অবিবাহিত মেয়েরা এই শাখা পূজা করেন। এটি করম উৎসব নামে পরিচিত।

বান্দনা/সাহারাইঃ

নভেম্বর মাসে কার্তিক অমাবস্যার পবিত্র দিবসের পালিত আরেকটি জনপ্রিয় উপজাতীয় উৎসব বান্দনা বা সাহারাই। গ্রামবাসীরা তাদের পোষা প্রাণীদের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীদেরও প্রচুর গুরুত্ব দেয়। তারা মূলত তাদের জন্য পূজা করেন। লোকেরা

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

তাদের গরুগুলিকে বা মহিষগুলিকে স্নান করান এবং তাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান ও বিভিন্ন রং দিয়ে সাজান। সাঁওতাল লোকেরা সোনার হলুদ ধান ক্ষেতের জন্য মা ভগবতীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

একেশ্বর গাজনঃ

এই উৎসবটি চৈত্র মাসে শেষের দিনে পালিত হয়। তারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত এবং একেশ্বর নামে পরিচিত মহাদেবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত লোকেরা এখানে চড়ক পূজা উদযাপন করে আনন্দের সাথে। এই মেলায় শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবার, মিষ্টি, জিলিপি, পাঁপড় ইত্যাদির বিভিন্ন দোকান বসে। এটি খুব জনপ্রিয় উৎসব বাঁকুড়ার।[১৩]

ধারার মেলাঃ

শুশুনিয়া পাদদেশে পালিত হয় এই ধারার মেলা। গ্রামবাসীরা নরসিংহ প্রতিমার পূজা করে এবং ঈশ্বরের ওই ধারার পবিত্র জলের নামে একটি মেলা বসে। গ্রামবাসীরা চড়ক পূজা দিয়ে এটিকে উদযাপন করে। মেলায় স্থানীয় নিদর্শন গুলির বিভিন্ন দোকানে প্রচুর মিষ্টি পাওয়া যায় ও অন্যান্য খাবার পাওয়া যায় এই মেলায়।[১৪]

ঝুমুরঃ

এটি একটি উপজাতীয় নৃত্য যা মাটিতে পরিবেশিত হয়। নৃত্যে অংশ নেয়া মহিলারা একে অপরের কোমর ধরে এবং তাঁদের হাত-পা মাথা একই তালে মিলান এবং যথাক্রমে এগিয়ে যান পিছনে পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেন। এবং নিত্যকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাদল ও তাল বাজান।

ছৌনৃত্যঃ

এটি বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত নৃত্যরূপ। স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের পুরুষ নৃত্য শিল্পীরা তাঁদের উপর বিভিন্ন মুখোশ পরেন। এবং রাতে আখড়া নামে পরিচিত খোলা জায়গায় নাচেন। লোকসংগীত গান গাওয়া ও হয় বিভিন্ন মেঠো সুরে সুর করে মাদল সানাই ধামসা এবং মটকা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র গুলি যা একটি ছোয়ের সময় বাজানো হয়। রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য স্থানীয় উপন্যাসের দৃশ্যগুলি এই নৃত্যের দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়।[১৫] বাঁকুড়া কৃষির জন্য বিখ্যাত। এখানে আম এবং সরিষা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় সাঁওতাল ভূমিজ সর্দার এবং মুন্ডার মত উপজাতিগুলি বাঁকুড়াতে বসবাস করে এদের নিজস্ব কিছু কিছু

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

ভাষা আছে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল সমাজ তাদের নিজস্ব ভাষাতে কথা বললেও বাংলা ভাষাভাষী সমাজের সাথে বা পাশাপাশি থেকে বাংলা ভাষাতেও অনায়াসে সাবলীল ভাবে কথা বলতে পারে।

বাংলা ও সাঁওতালী ভাষার কিছু সংমিশ্রনঃ

বাংলা	সাঁওতালী	বাংলা	সাঁওতালী	বাংলা	সাঁওতালী
বাবা	বা	লাঙ্গল	নাহেল	নাভি	লাচ
কাড়া(মাইষ)	কাডা	আষাঢ়	আষাঢ়	চাল	চাউলী

সাঁওতালী ভাষাতেও যে শক্তি ও সম্পদ আছে। তা থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব সুন্দরভাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সাঁওতালী ভাষার কোনো লিপি বা ছাপ বা অক্ষর ছিল না। বাংলা লিপিতে আমরা এই ভাষা পড়তে পারি কিন্তু সামর্থ্য অনুধাবন করতে পারি না। সাঁওতালী ভাষায় অনেক গল্প ও কবিতা হয়েছে। অলচিকি ভাষা সাঁওতালী ভাষার প্রান।"মুন্ডা" রা মুন্ডারী ভাষায় কথা বললেও সাঁওতালী "অলচিকি" ভাষার মত গুরুত্ব পায়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুন্ডারা পিছিয়ে আছে। সাঁওতাল সমাজের মানুষজনের থেকে।

খাসিয়া, মুন্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের আদি পূর্বপুরুষদের মত গাছ, পাথর, পাহাড়, পশুপক্ষী, ফুল-ফলের পূজা করে থাকে দেবতা জ্ঞানে। এছাড়াও আদিবাসী কমদের অন্যতম প্রধান উৎস স্থল যাত্রা রথযাত্রা স্নানযাত্রা দোলযাত্রা ইত্যাদি উৎসব আদিবাসীদেরই দান। আর্য ব্রাহ্মণ আর উচ্চ বৌদ্ধরা এইসব লৌকিক ধর্ম উৎসব কে সুনজরে দেখতেন না। ১৫০০ বছর আগে থেকে ৬০০ বছর পূর্বে পর্যন্ত এদেশে সংস্কৃত ভাষা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত। তাই সংস্কৃত ভাষার সাথে সাঁওতালি শব্দের মিল থাকাই স্বাভাবিক। এই সমন্বয় না থাকলে তো ভাষার এইরকম আদান-প্রদান হত না। তবে কোন ভাষায় কোন শব্দ কোন ভাষা থেকে এসেছে, তা বলা কঠিন। সাঁওতালি ভাষার পুরনো রূপ কেমন ছিল, তা লিখিত আকারে তো নেই তবে বহু প্রাচীন কালে কেমন ছিল তা বলা কঠিন।[১৬]

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

ভারতবর্ষ তথা বিভিন্ন রাজ্যের নানা জেলায় খ্রিস্টান সমাজ গড়ে ওঠার আগে সাঁওতাল সমাজে কোন সামাজিক বিভেদ ছিল না। ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমস্ত জায়গার ভোজ ও আচার অনুষ্ঠান প্রায় একই ছিল, তবে খ্রিস্টান মিশনারীদের আবির্ভাব সাঁওতাল সমাজকে বিভক্ত করেছে। সাঁওতাল সমাজকে দুইভাগে ভাগ করেছে। আদি সাঁওতাল সমাজ ও খ্রিস্টান সমাজ। খ্রিস্টান সমাজে আবার দেখা যায় ক্যাথলিক সাঁওতাল সমাজ ও প্রোটেস্ট্যান্ট সাঁওতাল সমাজ। তবে একই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন আচর- অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়।[১৭]

বাঁকুড়া জেলায় প্রথম জনগণনা শুরু হয় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে। তৎকালীন সময়ে বাঁকুড়া জেলায় মোট ২৬২৩ বর্গমাইল এলাকা ছিল। তখন মোট জনসংখ্যা ছিল ৯৬৮৫৯৭, গ্রাম ছিল ৪৪৩৬ টি বসতবাড়ি ছিল ১৯০৯৭৮, এবং প্রতি বর্গমাইলের জনঘনত্ব ছিল ৩৬৯ জন। এই রিপোর্টটা বিশ-শতকের শুরুতেই পাওয়া যায়। এরপর ১৯৭১ সালের জনগণনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মোট বাঁকুড়ার জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ৩৮.৫% ভাজি আদিবাসী উপজাতি। বাঁকুড়ার কিছু অঞ্চল আছে যেখানে সাঁওতাল অধ্যুষিত। যেমন বিষ্ণুপুরে বেনাচাপড়া, ডুমনিশোল, বেলশুলিয়া, আগুনকুমারী, শ্যামনগর কার্টুল, মুড়াবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চল। এছাড়াও কিছু আছে দক্ষিণ বাঁকুড়ার অঞ্চল যেমন পরকুল, পাথরচূড়া, বাড়িকুল, কিনাবাড়ি, মিঠাআম প্রভৃতি এগুলি সব রানীবাঁধ থানার মধ্যে পরে। এই বাঁকুড়া অঞ্চলে করোটি সাঁওতাল গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন- সোরেন, হাঁসদা, বেসরা চঁড়ে, পাউবিয়া, বেদেরা , হেমব্রম, টুডু, মান্ডি, বাস্কে, মুর্মু ও কিসুক। এদের মধ্যে জীবিকাগত বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। [১৮]

বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী সমাজের যে খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি যে একে অপরের পরিপূরক এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না তবে খাদ্য সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস যে অল্প দিনের নয় সেটি ধীরে ধীরে অন্য জাতি ও তাদের সংস্কৃতি থেকেও আদিবাসী সমাজ পেয়েছে বা রপ্ত করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলা তথা পুরো ভারতবর্ষের আদিম জনজাতি হিসেবে আদিবাসী সমাজকে বোঝানো হয়েছে। তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস কেমন ছিল এটা স্পষ্ট করে বলার মত কোন পাঠ্য বা লিখিত কোন দলিল আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। তবে ইংরেজরা এদেশে আসার পর থেকেই জঙ্গলমহল বা রাজ অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। রেলপথ স্থাপনের ফলে সাধারণ

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

সমাজের সাথে আদিবাসী সমাজের যোগাযোগ স্থাপন ঘটে বিশেষত বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস যে অন্য সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এটা আমরা বলতে পারি।

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

তথ্যসূচি

১. পানিগ্রাহী, তারাশঙ্কর (২০০৯), ব্রিটিশ শাসনের আদি পূর্ব ও মল্লভূমের প্রাচীন অর্থনীতি, (১৮৫৭-১৮৩৩) সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃঃ ২৮-২৯।

২. রায়, নীহাররঞ্জন (১৩৮৭), বাঙালির ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৫২০ ।

৩. রায়, নীহাররঞ্জন (১৩৮৭), বাঙালির ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৫২৪-৫২৭।

৪. ভট্টাচার্য, অতনু (১৯৯৮), পশ্চিমবঙ্গের জাতি জনজাতি, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, পৃঃ ৩৮ – ৩৯।

৫. ভট্টাচার্য, অতনু (১৯৯৮), পশ্চিমবঙ্গের জাতি জনজাতি, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, পৃঃ ৪২।

৬. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ (১৯৯৯), বাঙালীর ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা একাডেমী, কলকাতা, পৃঃ ১১৫-১১৭।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর (২০১৩), পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস, আদিবাসী সংস্কৃতির কেন্দ্র, কলকাতা, পৃঃ ২০১।

৮. মুরা, চণ্ডীচরন (২০১৪), লোকসংস্কৃতি সংকট ও সম্ভাবনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,
কলকাতা, পৃঃ ১০৮-১০৯।

৯. চক্রবর্তী ,প্রনবেশ (২০০৬), বাংলার পূজা পার্বণ উৎসব, ডাইনামিক পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ১০১-১০২।

১০. ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১৮), বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৭৭- ৭৮ ।

১১. ডা: মন্ডল, চিত্ত ,ডা: মন্ডল, প্রথমারায় (১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩), বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, অন্নপূর্ণা প্রকাশন ,কলকাতা, পৃঃ ৫০-৫১।

১২. ঘোষ, বিনয় (১৩৮৬), বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, দি প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৯২-৯৩।

১৩. চক্রবর্তী, বানেশ্বর নববর্ষ (১৪১৮), পাঁশকুড়ার ইতিবৃত্ত, নান্দনিক, কলকাতা, পৃঃ ৩০-৩১।

১৪. হেমব্রম, পরিমল (২০১৫), সাঁওতালী সাহিত্যের ইতিহাস, নির্মলা বুক এজেন্সি চতুর্থ মুদ্রন, কলকাতা, পৃঃ ১০৩- ১০৪ ।

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

১৫. চট্টোপাধ্যায়, তুষার (২০০৪), লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান , এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রা: লি: চতুর্থ সংস্করন, কলকাতা পৃঃ ১২৫ ।

১৬. বাস্কে ,ধীরেন্দ্রনাথ (২০০৫), সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খন্ড ,সুবর্নরেখা , কলকাতা, পৃঃ ২৪- ২৫ ।

১৭. ডা: দে, গদাধর (২০২১), বাংলার ভোজ ও ভোজন বিচিত্রা, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৫০।

১৮. সেন, গৌরপদ (২০১১), মল্লভূমি জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা, ভারতবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র বর্ধমান, কলকাতা, পৃঃ ১৩৮।